খালেদা জিয়ার শাসনামল ও মানুষের মৃত্যু

স্বদেশ রায়

বন্যায় মৃতের সংখ্যা প্রতিদিন বাড়ছে। ২৮ জুলাই ওয়াশিংটন পোস্টের খবর, বাংলাদেশে বন্যায় মৃতের সংখ্যা ৩৯৪। ২৫ তারিখের পাকিস্তানের ডনের খবর ছিল মৃতের সংখ্যা ২১০। এর অর্থ প্রতিদিনই মৃতের সংখ্যা বাড়ছে। প্রতিটি সংবাদপত্র ও নিউজ এজেন্সি যেমন প্রতিদিনের মৃত্যুর সংবাদ দিচ্ছে তেমনি আরও জানিয়ে যাচ্ছে, মৃতের সংখ্যা বাড়বে। দেশী নিজ দলীয় কয়েকটি সংবাদপত্র ছাড়া বেশিরভাগ সংবাদপত্র নিয়ে সরকারের নানা প্রশ্ন। সরকারের মন্ত্রীরা বন্যার শুরুতে এসব সংবাদপত্র নিয়ে নানা প্রশ্ন তুলেছিলেন। এমনকি তাঁরা এ কথাও বলেছিলেন, কিছু কিছু সংবাদপত্র বন্যার পুরনো ছবি ছাপিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। মন্ত্রীরা এ কথা বলার দশ দিন পর প্রধানমন্ত্রী বন্যার্তদের পাশে কয়েক মুহূর্তের জন্য হলেও গিয়ে স্বীকার করেছেন দেশে বন্যা হচ্ছে। কবে থেকে দেশ বন্যাকবলিত সেটা স্বীকার করেননি। বিবিসি তাদের প্রতিবেদনের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছে, বাংলাদেশ প্রায় এক মাসের বেশি সময় ধরে বন্যার পানির নিচে। দেশি ও বিদেশী প্রচারমাধ্যম আর যে বিষয়টা বার বার সামনে আনছে তা হলো মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। কারণ, সরকার সঠিকভাবে বন্যাকালীন ব্যবস্থাপনা নিতে পারছে না। তা ছাড়া সরকারের এ ব্যবস্থাপনা নেবার কোন প্রস্তুতিও নেই। সরকারের প্রস্তুতি না থাকারই কথা। কারণ, যে সরকার বন্যা শুরু হবার বিশ দিনের ভিতর স্বীকার করেনি দেশে বন্যা হচ্ছে, ওই সরকার প্রস্তুতি নেবে কীভাবে? আর সরকারের দুর্যোগ মোকাবিলার প্রস্তুতি না থাকলে সাধারণ মানুষ মারা যাবে এটাই তো স্বাভাবিক। সে মৃত্যুর দিকেই দেশের বন্যাকবলিত বহু মানুষ এগিয়ে চলেছে। কারণ, বন্যাকবলিত এলাকায় না আছে কোন ত্রাণ, না আছে পানি শোধন বা খাবার স্যালাইনের ব্যবস্থা। এসব কেন নেই সে বিষয়ে যাবার আগে সামনে আসে বেগম জিয়া দেশ চালালে কেন এ প্রস্তুতি থাকে না? কেন প্রতিটি দুর্যোগের অনেক পরে সরকার উপলব্ধি করতে পারে দেশে একটি দুর্যোগ এসেছে। বেগম জিয়ার প্রথম শাসন আমলে অর্থাৎ ১৯৯১ সালের ২৯ এপ্রিল দেশে প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় হয়। খুব বেশিদিন আগের ঘটনা নয় এটা। তাই সকলের মনে থাকার কথা, সেদিনও কিন্তু প্রথমে অস্বীকার করা হয়েছিল একটা বড় ধরনের ঘূর্ণিঝড় চট্টগ্রাম উপকূলে আঘাত হেনেছে। ৩০ এপ্রিল ১৯৯১-এর রাতের বিটিভির খবর যাঁরা শুনেছিলেন তাঁদের সকলের মনে থাকার কথা, সেদিন সরকারী সূত্রের বরাত দিয়ে বলা হয়েছিল, ঘূর্ণিঝড়ে তেমন কোন ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। এমনকি চট্টগ্রামের উপকূলীয় এলাকাগুলো যে মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন সেটা তখনও স্বীকার করা হয়নি। এমনকি দেশীয় সাংবাদিকদের সঙ্গে বিবিসি, রয়টার, এএফপির সাংবাদিকরা যখন ঘূর্ণিকবলিত এলাকায় পৌঁছে গেছে তখনও সরকার ছিল দোলাচলে। অর্থাৎ বিষয়টি স্বীকার ও অস্বীকারের মাঝামাঝি।

অথচ এ কথা আজ ঐতিহাসিক সত্য, সরকারের ব্যর্থতার কারণে ১৯৯১ সালে বাংলাদেশে যত লোক মারা গিয়েছিল এত লোক ইয়াহিয়া খানের আমলে ছাড়া আর কখনও মারা যায়নি। '৯১-এর ঘূর্ণিঝড়ের মোট মৃতের সংখ্যা শেষ পর্যন্ত সরকার জানায়নি। তবে ২৯ এপ্রিল রাতে ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানার পরে ৪ মে সরকারী সূত্র থেকে জানানো হয়েছিল ঝড়ে মৃতের সংখ্যা ৯২,২৮৪জন। বিএনপি বা বাংলাদেশের ডানপন্থী যাবতীয় দল প্রায়ই ১৯৭৪-এর দুর্ভিক্ষ নিয়ে বড় গলায় কথা বলে। এমনকি বেগম জিয়া ১৯৯১-এর নির্বাচনের আগে দৈনিক বাংলার মোড়ে দেয়া এক জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে বঙ্গবন্ধুকে ইঙ্গিত করে বলেছিলেন, ওই যে এক নেতা ছিল, তার আমলে কাফন জোটেনি। কলাপাতা জড়িয়ে মানুষকে কবর দেয়া হয়েছিল। 'ওই যে এক নেতা' বলতে তিনি বঙ্গবন্ধুকে বুঝিয়েছিলেন। আর কাফন না পাবার কথা উল্লেখ করে তিনি '৭৪-এর বন্যাপরবর্তী দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতা বুঝিয়েছিলেন বা ব্যঙ্গ করেছিলেন বঙ্গবন্ধুর ব্যর্থতা নিয়ে। বেগম জিয়া একা নন, বাংলাদেশের অন্য সকল মৌলবাদী দলের নেতারা বঙ্গবন্ধুর ব্যর্থতা তুলে ধরতে গিয়ে '৭৪-এর দুর্ভিক্ষের কথা বলেন। আর কোন নির্বাচন এলে তো কথা নেই! তখন হাজার কণ্ঠ এক সঙ্গে সরব হয়ে ওঠে। ভাবখানা হয়ে দাঁড়ায় এমন যে, আওয়ামী লীগ ও '৭৪-এর দুর্ভিক্ষ যেন সমার্থক বিষয়। বেগম জিয়ার প্রতিটি বক্তৃতায় থাকে এ কথা। কিন্তু বেগম জিয়া কি একবার সরকারী নথি মিলিয়ে দেখেছেন তাঁর আমলে ১৯৯১-এ যত লোক মারা গিয়েছিল '৭৪-এর দুর্ভিক্ষে তার চার ভাগের এক ভাগ লোক মারা যায়নি। বেগম জিয়া নিশ্চয়ই অস্বীকার করবেন না, তাঁর আমলে ১৯৯১-এর ৪ মে সরকারী তথ্য বিবরণীতে উল্লেখ করা হয়েছিল, উপকূলে মৃতের সংখ্যা ৯২,২৮৪জন। অন্যদিকে ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪-এ কৃষি শুমারীর দেয়া তথ্য অনুযায়ী মৃতের সংখ্যা ২৭,৪৩১জন। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে বেগম জিয়ার তুলনা কোন সুস্থ লোক করবেন না। তবে দেশের যে কোন সত্য একজন রাজনীতিককে কীভাবে স্বীকার করতে হয় সেটা জানার জন্য বা পার্লামেন্টের কাছে দায়বদ্ধতা উপলব্ধির জন্য দেখা যেতে পারে বঙ্গবন্ধু সেদিন কীভাবে এসত্য স্বীকার করেছিলেন। ২৫ জানুয়ারি ১৯৭৫ পার্লামেন্টে দেয়া ভাষণে তিনি বলেছিলেন, 'ভিক্ষার ঝুলি হাতে নিয়ে দুনিয়া ঘুরতে হয়েছে। খাবার দুনিয়া থেকে আনতে হয়েছে। গ্রামে গ্রামে পৌঁছাতে হয়েছে। সমস্ত দুনিয়ায় যে ইনফ্লেশান হয়ে গেল, শুধু আমরা না, সমস্ত দুনিয়ায় যারা অনুন্নত দেশ তাদের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল–সঙ্গে সঙ্গে আসল এক ভয়াবহ বন্যা। এত বড় বন্যা আমার জীবনে আমি দেখেছি কিনা সন্দেহ–না ছিল খাবার-৮ হাজার ৭শ' লঙ্গরখানা খোলা হলো। বন্ধুদের কাছ থেকে সাহায্য নিয়ে, নিজেদের যা ছিল তাই নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। বাঁচাতে পারলাম না সকলকে। ২৭০০০ লোক না খেয়ে মারা গেল।' অন্যদিকে ১৯৯১-এর প্রাকৃতিক দুর্যোগে বাংলাদেশে ৪ সেপ্টেম্বর ১৯৯১ পর্যন্ত দেয়া সরকারী হিসেবে ৯২,২৮৪জন লোক মারা গেলেও খালেদা জিয়া কিন্তু এ দায় কখনও স্বীকার করেননি। পার্লামেন্টের কাছে সরকারের যে দায়বদ্ধতা থাকে সে দায়বদ্ধতাও রক্ষা করেনি পার্লামেন্টকে সংসদ নেত্রী হিসেবে খালেদা জিয়া। জানাননি মোট কত লোক সেদিন প্রাকৃতিক দুর্যোগে মারা গেছে। অবশ্য এ বলতে না পারার তাঁর বড় কারণ হলো, '৭৪ যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশেও মানুষকে বাঁচানোর জন্য রাজনৈতিক দল ও সরকার ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। কিন্তু '৯১-এ তুলনামূলকভাবে যথেষ্ট গুছিয়ে ওঠা একটা দেশে যে লাখ লোক মারা গেল তার কারণ সরকারের ব্যর্থতা। সরকারের ব্যর্থতা কতটা বেশি ছিল তা সেদিন যাঁরা ওই এলাকায় গিয়েছিলেন তাঁরা জানেন। বেগম জিয়া তাঁর বক্তৃতায় '৭৪-এর মানুষের মৃত্যু নিয়ে বঙ্গবন্ধুকে ব্যঙ্গ করতে গিয়ে মানুষের দাফন নিয়েও ঠাট্টা করেন। কিন্তু '৯১-এ যাঁরা উপকূলে গিয়েছিলেন তাঁরা দেখেছিলেন মানুষের দাফনটুকু করতেও সেদিন সরকার কতটা ব্যর্থ হয়েছিল। মারা যাবার তিন চার দিন পরে সেনাবাহিনী গিয়ে বড় বড় গর্ত খুঁড়ে এক সঙ্গে অনেক মৃতদেহ সে গর্তে চাপা দিয়ে রাখে। চার-পাঁচ দিন জোয়ারের সময় সমুদ্রের কূল ঘেঁষে মাছের ঝাঁকের মতো ভাসতে দেখা গিয়েছিল মানুষের মৃতদেহ। না, সে হতভাগাদের দাফন হয়নি। সাগরের পানিতে আর হাঙ্গর কুমিরের পেটে মিশে গিয়েছিল তাদের মৃতদেহ। সে যে কত মৃতদেহ তা না দেখলে বোঝানো সম্ভব নয়। পত্রপত্রিকায় সেদিন এ মৃতের সংখ্যা কিন্তু পাঁচ লাখ বলা হয়েছিলো।

এই যে বিপুল সংখ্যক মানুষের মৃত্যু এ কিন্তু দেশের কোন অভাব বা অপারগতার কারণে ঘটেনি। এটা ঘটেছিল সরকার পরিচালনার দায়িত্বহীনতার কারণে বা যোগ্যতার অভাবে। বেগম জিয়ার যাঁরা অতি ঘনিষ্ঠ তাঁরাও কিন্তু লিখিতভাবে বেগম জিয়ার সরকারকে স্থবির সরকার বলে চিহ্নিত করেন। তাঁরা আকার ইঙ্গিতে খালেদা জিয়ার সিদ্ধান্ত নিতে না পারার কথাটা উল্লেখ করেন। সিদ্ধান্ত নিতে যে খালেদা জিয়ার অসুবিধা হয় তিনি নানা দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভোগেন এটা এখন দেশবাসীর কাছে স্পষ্ট। সকলেই এখন খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনার পার্থক্য করেন এভাবে–খালেদা জিয়া সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষেত্রে দ্বিধায় ভোগেন। এ কারণে তাঁর আমলে যে কোন সিদ্ধান্ত আসতে দেরি হয়। অনেক সিদ্ধান্ত নেয়া হয় না। আর ভুল হোক ঠিক হোক শেখ হাসিনা সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন দ্রুতই। কিন্তু খালেদা জিয়ার শুভ কামনা করেন এমন অনেকেই আরেকটি বিষয় মনে করেন। তাঁদের কথা হলো, খালেদা জিয়ার নিজের সিদ্ধান্ত নিতে না পারার বিষয়টি আছে ঠিকই, তবে এর চেয়েও বড় হলো তাঁর আমলে কখনই মুক্তিযোদ্ধা অফিসারদের সামনে আনা হয় না। বাংলাদেশের শুরু থেকেই এ একটা বড় সমস্যা। কারণ দেশে মুক্তিযুদ্ধ বা দেশের বিরোধিতাকারী একটা শক্তি ছিল। পরবর্তীকালে রাজনৈতিক

পটপরিবর্তনের ফলে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী একটা চেতনা প্রকাশ্যে বেড়ে ওঠার সুযোগ পেয়েছে। এ শক্তিটির দেশের প্রতি ভালবাসা ও আনুগত্য সত্যিকারে কম। বিশেষ করে ভালবাসা তো নেই বলা চলে। তাই এ ধরনের লোকেরা যখন সিদ্ধান্ত নেবার দায়িত্ব পায় তখন তাঁদের সিদ্ধান্তের সঙ্গে ভালবাসা কাজ করে না। যখনই কোন সিদ্ধান্তে ভালবাসা কাজ করে না তখন সেটা দেশের মানুষের বিপরীতে যায়। দেশের মানুষের ও দেশের মানুষের জীবনের বিপরীতে এ ধরনের অনেক সিদ্ধান্ত কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমানের আমল থেকে হয়ে আসছে। তখন হয়েছে গোপনে বা রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের অগোচরে। অন্যদিকে খালেদা জিয়ার সরকারই বাংলাদেশে প্রথম সরকার যে আমলে মুক্তিযোদ্ধা অফিসার বা মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসীদের কম গুরুত্ব দেয়া হয়। জিয়া বা এরশাদ আমলে মুক্তিযোদ্ধা অফিসারদের যতটুকু গুরুত্ব দেয়া হয়েছে সেটাও দেয়া হয় না। যে কারণে তাঁর প্রথমবারের ক্ষমতার সময়ে একজন মুক্তিযোদ্ধা অফিসার শেষ পর্যন্ত তাঁর পাশে থাকতে পারেননি। এবারও যে তিনি কতদিন থাকতে পারবেন তা নিয়ে প্রশ্ন আছে! কারণ, '৯১ -৯৬ ক্ষমতাকালের চেয়ে এবার মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী অফিসারদের জন্য আরও দুঃসময়। কারণ, এ সরকারের রাজনৈতিক কর্মসূচীই হলো সামরিক, বেসামরিক সকল প্রশাসনে মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসীদের কোণঠাসা কর এবং আস্তে আস্তে সরিয়ে ফেল। কিন্তু বাংলাদেশকে এ সত্য সব সময় মানতে হবে, মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী অফিসার ছাড়া কখনই প্রশাসন সচল হবে না।

যেমন বিএনপি ও আওয়ামী লীগকে যাঁরা একই পাল্লায় মাপেন তাঁরাও বলেন, শেখ হাসিনার সরকার সচল ছিল। বিশেষ করে এ বন্যায় যখন মানুষ মারা যাচ্ছে, সরকার ও প্রশাসন নির্বিকার সে সময়ে অনেকেই বলতে শুরু করেছেন শেখ হাসিনার আমলে '৯৮-এর বন্যায় সরকার এর চেয়ে অনেক বেশি সচল ছিল। বন্যায় ওই সরকারের তৎপরতা অনেক বেশি ছিল। এমনকি একজনও লোক মারা যায়নি। এর একটা কারণ হয়ত, আজ অনেকটা পচে গেলেও দল হিসেবে আওয়ামী লীগের এখনও কিছু অবশিষ্ট আছে। এই তো যেমন আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুল মমিন মারা যাবার পরে, প্রফেসর জিল্লুর রহমান সিদ্দিকি লিখলেন, ভদ্রলোক বলতে যা বোঝায় আব্দুল মমিন তাই ছিলেন। বাস্তবে আব্দুল মমিনকে যাঁরা জানতেন তাঁরা সকলেই জানেন, শিক্ষিত ভদ্রলোকের প্রতিমূর্তি বলতে যা বোঝায় তিনি তাই ছিলেন। এমনি কিছু ভদ্রলোক এখনও দেশের নানা প্রান্তে আওয়ামী লীগে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন। আর ঠিক তেমনি এখনও কিছু নিবেদিত কর্মী ও সমর্থক আওয়ামী লীগে আছেন। যাদেরকে এখনও রাজনীতি মানে চুরি, পেট মোটা করা, এ নীতি ছোঁয়নি। বন্যার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগে শেখ হাসিনা এদেরকে সঙ্গে পেয়েছিলেন। প্রশাসনে পেয়েছিলেন মুক্তিযোদ্ধা অফিসারদের। যাঁদের দেশপ্রেম প্রশাসনকে স্বাভাবিকভাবে সচল করে তোলে। যেমন শেখ হাসিনা এক ভয়াবহ বন্যা সফলভাবে কাটিয়েও দেশকে চালে স্বয়ং সম্পূর্ণ করতে পেরেছিলেন। এর পিছনে কিন্তু একজন দেশপ্রেমিক মুক্তিযোদ্ধা অফিসারের কৃতিত্ব আছে। এই অফিসার হলেন এম, আনিসুজ্জামান। যাঁরা ডক্টর ইউনূসের আত্মজীবনী পড়েছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই জানেন, আজকের গ্রামীণ ব্যাংক সৃষ্টির শুরুতে এ ভদ্রলোকের অবদান কতটা। কেবলমাত্র দেশপ্রেম ও দেশের মানুষের প্রতি ভালবাসা ছিল বলে, আনিসুজ্জামান সেদিন গ্রামীণ ব্যাংক শুরু করতে ওইভাবে সাহায্য করতে পেরেছিলেন। কৃষিপ্রধান দেশের কৃষি ও কৃষক নিয়ে এ ভদ্রলোকের ভাবনা দীর্ঘকালের। তাই তাঁকে খাদ্যমন্ত্রীর উপদেষ্টা করে সুফল পেয়েছিলেন শেখ হাসিনা। দেশ প্রথমবারের মতো চালে স্বয়ং সম্পূর্ণ হয়। আবার এ দেশপ্রেম ছাড়া যে ভালো কিছু হয় না তারও বড় প্রমাণ কিন্তু শেখ হাসিনার আমলে পাওয়া যায়। সৎ বলে কথিত গোপন জামায়াত নেতা শাহ আব্দুল হান্নানকে এনবিআরের চেয়ারম্যান করেছিলেন শেখ হাসিনা। তাঁর চাকরির সময়কালও বাড়িয়েছিলেন। এমনকি তাঁকে করেছিলেন অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সচিব। এর মাসুল শেখ হাসিনাকে রেভিনিউ খাতে দিতে হয়েছিল। পরে বুঝতে পেরে তাঁকে অভ্যন্তরীণ সচিবের পদ থেকে সরিয়ে দেন। কিন্তু ততদিনে অনেক দেরি হয়ে গেছে। ক্ষতি যা করার তা তিনি করে ফেলেছেন। আবার দেখা যায় গোষ্ঠী স্বার্থসহ নানা স্বার্থের কারণে তিনি কাজে লাগাতে পারেননি বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধের প্রতি আন্তরিকভাবে বিশ্বস্ত অফিসার মোফাজ্জল করিমকে। সেটা তাঁর জন্য ব্যর্থতাই হয়েছে। অথচ আজ মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী শিবিরে বসেও নিজের বিশ্বাস অনুযায়ী কাজ করছেন মোফাজ্জল করিম। যার বড় প্রমাণ জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে তিনি যে তিনটি ছবিকে পুরস্কার দিয়ে গেছেন তিনটি ছবিই জোট সরকারের আদর্শের বিরুদ্ধে। তিনটি ছবিই মৌলবাদের বিপক্ষে, মুক্তিযুদ্ধ ও বাঙালী সংস্কৃতির পক্ষে। এর থেকে এটা স্পষ্ট হয়, মুক্তিযুদ্ধের প্রতি রাজনৈতিক ও বিশ্বাসগত আনুগত্য ছাড়া বাংলাদেশে সচল প্রশাসন চালু সম্ভব নয়। এ আনুগত্য নেই বলেই খালেদা জিয়া যখনই ক্ষমতায় আসেন সরকার হয়ে পড়ে স্থবির। কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগে স্থবিরতার সুযোগ নেই। অথচ এ স্থবিরতা থাকে বলেই, খালেদা জিয়ার আমলে প্রাকৃতিক দুর্যোগ এলেও সরকার নড়ে না। ফলে মারা যায় মানুষ। ১৯৯৮-এর বন্যায় একজনও মানুষ মারা যায়নি। এবার শুরু থেকে মারা যাচ্ছে। অন্যদিকে ত্রাণ আর চিকিৎসার যে হাল এটা যদি বজায় থাকে তাহলে না জানি কত মৃত্যু নেমে আসে?

কলকাতার চিঠি

অমিত বসু

২ আগস্ট

সোমবার ২ আগস্ট ১২ ঘণ্টা বন্ধ পশ্চিমবঙ্গ। হরতালের তালে রাজনীতির পালে হাওয়া লাগাবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মাসুল দেবে রাজ্য। তৃণমূলের নেতারাই বেঁকে বসেছেন। সমর্থন নেই। তিতিবিরক্ত প্রত্যেকে। একে একে কংগ্রেসের দিকে পা বাড়াচ্ছেন। সিপিএম মমতাকে রুখতে জনসমাবেশ ডেকেছে। রোডে গণতান্ত্রিক আইনজীবী সংঘের সভা। ১৯ জুলাই বিধানসভায় ভাংচুর চালিয়ে কাগজের হেডলাইনে উঠেও তৃণমূল তলাচ্ছে অতলে। নাগালে পেতে মমতার শেষ অস্ত্র হরতাল। কোন কথাই মানছেন না মমতা। বলেছেন, ২৮ বছর ধরে চুপ করে থেকেছি। শান্তির রাস্তায় রাজনীতি করেছি। দলের ছেলেদের গুলিগোলা-বন্দুক ধরতে শেখাইনি। কিন্তু ভালমানুষের দিন শেষ। এবার ব্যালট নয়, বুলেট। আমি আহত বাঘ। দেখি, আমায় থামায় কে। সিপিএম রাজ্য কমিটির সম্পাদক অনিল বিশ্বাস বলেছেন, মমতার ভুল। উনি বাঘ নন, বাঘিনী। আইন ভাঙলেও খাঁচায় পুরব না। দেখি, দৌড় কতটা।

প্রধানমন্ত্রী হবেন

১৪ আগস্ট পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবস। ১৫ আগস্ট আলো-আঁধারে মেশা দিন। বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমানের মৃত্যু, ভারতের স্বাধীনতা উৎসব। ১৫ আগস্ট শূটিং শুরু করতে চেয়েছিলেন দেবানন্দ। এ কারণেই এক দিন পিছিয়ে ১৬ আগস্ট আশি বছরের তরুণ ক্যামেরার সামনে দাঁড়াচ্ছেন। 'মিস্টার প্রাইম মিনিস্টার' ছবিতে প্রধানমন্ত্রী হবেন। প্রধানমন্ত্রী হওয়া সোজা কথা নয়। দেবানন্দ কিন্তু নিশ্চিন্ত। বলেছেন, ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর ঘনিষ্ঠ ছিলাম। কাছ থেকে দেখেছি। লালবাহাদুর শাস্ত্রী, মোরারজী দেশাই, অটল বিহারী বাজপেয়ীর আচার-আচরণ সামনে থেকে লক্ষ্য করেছি। তাঁদের সুখ-দুঃখের সঙ্গে পরিচিত। তাঁরাও ব্যক্তিগত অনুভবের বেড়াজালে বন্দী। লোকের সামনে নিজেকে লুকিয়ে রাখেন। 'লার্জার দ্যান লাইফ' ইমেজ তৈরির চেষ্টা করেন। আড়াল ছিঁড়ে আসল মানুষটিকে বার করে আনাই হবে কাজ। 'আঁধি' ছবিতে ইন্দিরা গান্ধী হয়েছিলেন সুচিত্রা সেন। 'বোম্বাই কা বাবু'তে সুচিত্রার নায়ক ছিলেন দেবানন্দ। এবার প্রধানমন্ত্রী। পাশে কোন নায়িকা নেই।

পালা বদল

নতুন পাতায় প্রত্যয়ের সন্ধান পেলেন রবীন্দ্রনাথ। পুরনো সরিয়ে নবীনের আহ্বান বিশ্বভারতীতে চিরদিন। আচার্য অটল বিহারী বাজপেয়ীর মেয়াদ ফুরিয়েছে জানুয়ারিতে। শূন্যস্থান পূরণ সম্পূর্ণ। দায়িত্ব কাঁধে নিচ্ছেন মনমোহন সিং। তালিকায় তিনজনের নাম ছিল। প্রথমে মনমোহন, তাঁকে অনুসরণ করেছেন বিজ্ঞানী রাজা রামাশ্রয়, যশপাল। রাষ্ট্রপতি এপিজে আবদুল কালাম শেষমেশ নিয়োগ করেছেন মনমোহনকে। অসাধ্য সাধনের দায়িত্ব। রবীন্দ্রনাথের নোবেল পদক লুপ্ত। সাবেক উপাচার্য দিলীপ সিংহ অন্যায়ের অরণ্যে নির্বাসিত। পরিবেশ বিষিয়েছে বিশৃঙ্খলায়। শিক্ষার্থীরা অনিশ্চয়তার অন্ধকারে। রবীন্দ্রনাথের আদর্শ নেই। সহজ, সাফল্যের লোভে অসুন্দর বরণ নির্দ্বিধায়। অশান্তির আগুন শান্তিনিকেতনে। জঞ্জাল জমেছে পর্বতপ্রমাণ। সরানোর নামগন্ধ নেই। সঙ্কটের কাঁটায় ক্ষতবিক্ষত বিশ্বভারতীতে পা রাখতে হবে মনমোহনকে। পালা বদলেও কতটা বদলাবে বিশ্বভারতী। বলবেন মনমোহন। করবেন মনমোহন, দেখবেন সবাই।

কিছু ভাল লাগে না

লিয়েন্ডার পেজের কিছুই ভাল লাগে না। টেনিস কোর্টে পাশে মার্টিন নাভ্রাতিলোভা বা মহেশ ভূপতিকে পেয়ে একটু স্বস্তি। তারপর শূন্যতায় ম্লান। মন দখল করে মহিমা চৌধুরী। ফোনে ধরতে গিয়েও ধরেন না। মুম্বাইয়ের টিকিট কেটেও বাতিল করেন। দেখা নাহয় না হলো, কথা বলতে কী এসে যায়! সরে থেকেই সুখ। দূরে থেকেও কাছে না কেবল দূরত্ব। লিয়েন্ডার বর্তমান বাদ দিয়ে অতীতে ডুবেছেন। বলেছেন, লেখাপড়ায় মন ছিল না কোন দিন। ছোট থেকেই খেলা আর খেলা। লামা টিনিয়ার্সে ক্লাস সেভেনে পড়া শেষ। বেশ লাগত ফুটবল খেলতে। হাঁটুর চোটে আটকে গেল। হকি